পূর্ব-পুরুষ / নারী

মেসবাহ (১৮)

জাহাজের ক্যাডেটদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটা হচ্ছে পোজ দিয়ে ছবি তোলা, বিশেষ করে জাহাজ যখন বিদেশের পোর্টে যায়। অনেকদিন পর পুরানো এ্যালবাম ঘেটে আমার ছোট মেয়ে প্রশ্ন করেছিলো, "বাবা, উনি কি তোমার দাদা?" মোমের তৈরী কলম্বাসের পাশে দাড়িয়ে তার টুপির মত টুপি পরে ছবি তুলেছিলাম।

"উনি আমার দাদা নন, তবে পেশাগতভাবে আমাদের দাদার দাদা। এই ভদ্রলোকের নাম ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ৫০০ বছর আগে কাঠের জাহাজে পাল তুলে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমুদ্রে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, কাঠের জাহাজ থেকে লোহার জাহাজ, পালের বদলে স্টীম-ইঞ্জিন, তারপর ডিজেল, সাধারণ জাহাজ রূপান্তরিত হলো কন্টেইনার, ট্যাঙ্কার, ইত্যাদি।"

স্মার্টফোন এবং আইপেড ছাড়া সবকিছুতেই বাচ্চারা ধৈর্যহারা, ছোটখাট বক্তৃতা শুনে আমার মেয়েও ধৈর্যহারা। একজন মনোবিজ্ঞানী বলেছিলেন, "শিশুরা কথা শুনেনা, কারণ, ওদেরটা না শুনে আমাদেরটা শোনাই শিশুদের।" ধমক দিয়ে শিশুদের চুপ করিয়ে জিতে যাই আমরা, কিন্তু অন্তর থেকে শিশু আমাদের কথা না শুনে হারিয়ে দেয় আমাদের। আমার দাদার গল্প বলতে চেয়েছিলাম, শুধু মনোবিজ্ঞানীর বচন, তা নয়, আরও কিছু কারণে থেমে গেলাম। প্রতি বৎসর বাচ্চাদের নিয়ে দেশে যাই। ঢাকা, কখনো কক্সবাজার, কখনো সিলেটের নয়নাভিরাম পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু ওদেরকে নিয়ে পৈত্রিক ভিটায় শেষ কবে গিয়েছিলাম মনে করতে পারছিনা। পূর্ব-পুরুষ সমন্ধে আমার বাচ্চারা কিছুই জানেনা। গ্রামের নিরস গল্প শুনে বাচ্চারা অগ্রাহান্বিত হবে, মনে হয় না। বরং বক্তৃতা না দিয়ে লিখে রাখি, একদিন না একদিন পড়বেই।

অনেক অনেক দিন আগের কথা। ফাতেমা এবং আসিয়া দুই বোন বাস করতো বাংলাদেশের এক গ্রামে। তাদের বাবা একজন শিক্ষক, ছোট্ট দুই মেয়ের হাত ধরে নিয়ে যান স্কুলে প্রতিদিন। বাবার হাত ধরে স্কুলে যাওয়া ফাতেমা এবং আসিয়ার জন্য মহা আনন্দের ব্যাপার। পড়ার ফাঁকে টিফিন পিরিয়ড, বন্ধুদের সাথে গোল্লাছুট আর দারিয়াবান্ধা খেলায় ডুবে যায় দুই বোন।

কিন্তু আসিয়া আর ফাতেমা'র হাস্যজ্জ্বল দিনগুলো নিভে গেলো যখন তাদের প্রাণ-প্রিয় বাবা মারা গেলেন। ওরা দুই বোন স্কুলে যায়, সহপাঠীদের সাথে শ্রেণীকক্ষে বসে থাকে, কিন্তু মনে তাদের আগের মত আনন্দ নেই। টিফিন পিরিয়ডে আর গোল্লাছুট খেলতে ইচ্ছে করে না, আর কেউ তাদের হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যাবে না, বর্ষায় রাস্তায় কাদা জমে, বাবা তখন দুই মেয়েকে দুই কাঁধে তুলে নিতেন। এখন হাঁটু পর্যন্ত কাদা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে ওরা। বাবা নেই, যেন কিছুই নেই। এই ছোট্ট দুই শিশু বাবা হারানোর দুঃখ প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে। সুন্দর এই গ্রামের ছোট্ট একটা পরিবারে নেমে এলো অন্ধকার।

তাদের মা, নবিজা বুঝতে পারছেন, তিনি কুল-হারা সাগরের মাঝে পড়ে গেছেন, স্বামীর মৃত্যু উলট-পালট করে দিলো সবকিছু। তবুও তাকে তীরে ফিরতে হবে আসিয়া আর ফাতেমা'র জন্য। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, মেয়েরা তাদের বাবার অনুপস্থিতিতে মুষড়ে পড়েছে। একমাত্র মা-ই তাদের ভরসা, এখন তাকে সংসারের হাল ধরতে হবে। একজন পুরুষ সংসারের ঢাল, তার অনুপস্থিতিতে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা আসবে, আসবে ঝড়, মেয়েদের জন্য এই পৃথিবী এখন আর গোলাপ-এর বাগান নয়। এতদিন ফুলের মত এই শিশুদের রক্ষা করেছেন তাদের বাবা, এখন নবিজা শক্ত হাতে হাল না ধরলে ভেসে যাবে তরী।

আসিয়া আর ফাতেমার বাবা রেখে গেছেন প্রচুর জায়গা-জমি, আরও আছে গোয়াল ভরা গরু। বাড়িতে চারজন কামলা, ওরা হাল-চাষ নিয়ে ব্যস্ত থাকে সারাদিন। প্রতিদিন মেয়েদের স্কুলে পাঠানো, কামলাদের ভরণ-পোষণ, রান্না-বান্না, আর গৃহস্থালী কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন নবিজা। যখন ভেঙ্গে যাওয়া সংসারটা পুনর্গঠনে ব্যস্ত নবিজা, গ্রামবাসীরা তখন ভাবছে অন্য কথা। বিধবার দুই মেয়ে, দুদিন বাদে চলে যাবে শ্বশুর বাড়ি। এতো ধানি জমি তখন এই বুড়ির কি দরকার? মনে মনে সমীকরণ করে ফেললো অনেকেই, আশ্চর্যের ব্যাপার, এদের মধ্যে অনেকে নবিজার আত্মীয়, এতিম শিশুদের চাচা!

ময়মনসিংহের নামকরা স্বর্ণকার বৈঠক ঘরে বসে আছে, সাথে ফুলপুরের কাচারী ঘরের নায়েব বাবু, সেই সাথে আলী হোসেনের লাঠিয়াল। উঠান ভর্তি পাড়া- প্রতিবেশী, পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নবিজা। হুক্কায় টান দিয়ে আলী হোসেন বললো, "চাচা হিসাবে আমার দায়িত্ব আছে না? দুদিন পরে আসিয়া, ফাতেমার বিয়ে হবে, স্বর্ণ দিয়ে সাজায় না দিলে জামাই ভাত দিবো? মেরেই ফেলে কিনা, কে জানে? তুমি শুধু ওদের মা-ই হয়েছো, এইসব বুঝ? আজ ভাই থাকলে ওদের জন্য স্বর্ণের অলংকার বানিয়ে দিতনা? কি বলেন আপন-রা?"

প্রতিবেশীরা সমস্বরে বলল, "কথা ঠিক।"

"ও নবিজা, এই স্বর্ণকার অনেক দূর থেকে আসছে, তুমি বই দেখে অর্ডার দেও, টাকা পয়সার চিন্তা নাই, আমি চাচা না?"

নবিজা জানতো, আলী হোসেন একদিন আসবে দুষ্টবুদ্ধি নিয়ে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আট-ঘাট বেঁধে আসবে, সেটা সে বুঝতে পারে নি, নবিজা জিজ্ঞেস করলো, " ভাইজান, নায়েব সাহেবকে এনেছেন কেন?"

"এই দেখো, মেয়ে মানুষের কথা?" গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো আলী হোসেন, "আমি যে এত কিছু করছি, তার একটা রেকর্ড থাকবে না? রেকর্ড কে করে? বলেন আপনারা?"

গ্রামবাসীরা সমস্বরে বলল, "কাচারীর নায়েব।"

"নায়েবের রেকর্ডে কি লিখা? পড়ে শুনান," প্রশ্ন করলো নবিজা।

আলী হোসেনের রক্ত গরম হতে শুরু করেছে, "তোমার সাহস দেখে অবাক হই, ভাসুরকে হুকুম দেও, পড়ে শুনান?" গ্রামবাসীর দিকে তাকিয়ে বলল আলী হোসেন, "নবিজার পূবের বন্ধের জমির খাজনা বাকি, সরকারী হুকুম, অচিরেই নিলামে উঠবে। সেই নিলামে ডাক নিবে পূব পড়ার সমীর। আপনারা জানেন, নিলামে যতই দাম উঠুক, সমীর ডাক দিবেই, আমাদের বংশ থেকে জমিটা চলে যাবে অন্য গ্রামে। বিশ্বাস না হলে নায়েবকে জিজ্ঞেস করেন।"

গ্রামবাসীরা সমস্বরে বলল, "কথা ঠিক।"

নাবিজা খাজনার ব্যাপারে কিছু জানে না, তার স্বামী যখন মারা গেছেন, কিছুই বলে যাননি, মৃত্যু-তো আর জানান দিয়ে আসেনি। আলী হোসেন বুঝিয়ে বললো, "তোমার পুবের বন্ধের জমি যেন বেদখল না হয়, সেই ব্যাবস্থাই লিখা আছে দলিলে, তুমি শুধু টিপ-সই দিবা।"

পুবের বন্ধে এক দাগে ২০ একর জমি আছে, স্বর্ণের প্রলোভন দেখিয়ে সেই জমি দখলের চেষ্টা করছে আলী হোসেন, সেই সাথে নিলামের ভয়। নবিজা এটাও বুঝতে পারছে, পাড়া-প্রতিবেশী যারা আছে, তারা এখন আর এগিয়ে আসবে না, আর যারা আসল ঘটনা বুঝেছে, তারাও চুপ মেরে থাকবে। নাবিজা ভাবছে, এখন কি করবো আমি? এই মুহূর্তে ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে খবর দেওয়া যায়। উনি কি করবেন? হয়ত বলবেন, "এটা তোমাদের পারিবারিক ব্যপার, তোমরা নিজেরাই মিটমাট কর।" আসলেই জমি নিলামে উঠবে কিনা, সেটার সত্যতা যাচাই করা দরকার। নায়েব বলতে পারে সঠিক ভাবে, কিন্তু নায়েব এসেছে আলী হোসেনের সাথে। আলী হোসেন নায়েবকে হাত করে দলিল তৈরী করে এনেছে। বাইরে লাঠিয়াল দাড়িয়ে আছে, টিপ-সই না দিলে আলী হোসেন তুলকালাম কান্ড করে ফেলতে পারে। এই অবস্থায় নবিজা কি করবে বুঝতে পারছে না।

আলী হোসেন চিৎকার দিয়ে বললো, "নবিজা, আমাদের কাজ-কাম আছে, সারাদিন এতগুলো মানুষকে বসিয়ে রাখার দুঃসাহস দেখাবা না।"

নবিজা বললো, "আমি টিপ-সই দিবো, কিন্তু মসজিদের ঈমাম সাহেবের সামনে, তাকে খবর দেন।"

আলী হোসেন বলল, "আমরা তোমার পর? বিশ্বাস নাই?"

গ্রামবাসীরা বললো, "নাবিজা বলেছে, টিপ-সই দিবে, ঈমাম সাহেবরে খবর দিতে অসুবিধা কি?"

আলী হোসেন বুঝতে পারছে, এখানে তর্ক করলে গ্রামবাসীরা বিপক্ষে চলে যাবে, ওদেরকে বিপক্ষে রেখে কাজ হাসিল করা দুস্কর, "তোমদের মতামত সবার উপরে, খবর দাও ঈমাম সাহেবকে।" বাড়ির বাইরে হাজার মানুষ জড়ো হয়ে গেছে, স্বর্ণকার, কাচারীর নায়েব বাবু, লাঠিয়াল, আরো আসছে ঈমাম সাহেব। নাটকের শেষ দৃশ্য না দেখে এই জনতা চলে যাবে, মনে হয় না। নাটকের মূলে এক অসহায় বিধবা নারী। শিকারীর মুখ থেকে নিজেকে নয়, বাচ্চাদের রক্ষা করতে সিংহী ঝাপিয়ে পরার আগে চোখে মুখে ফুটে তুলে প্রতিরক্ষার দৃঢ়তা। অসহায় শিশু আসিয়া এবং ফাতেমা তাদের মার মুখে সেই প্রতিবিম্ব দেখে আঁচল আঁকড়ে লুকিয়ে রইলো।

ইমাম সাহেব বাড়িতে আসতেই উঠানে তাকে চেয়ার দেওয়া হলো বসার জন্য। দরজার আড়াল থেকে নাবিজা বললো, "স্বর্ণকার বাবু, আপনাকে গহনার অর্ডার দিব আরেকদিন, আজ নয়, বরং আজ আমার এই গহনাগুলো নিয়ে যান, যা দাম হয়, সেটা ঈমাম সাহেবের হাতে দিবেন। আর ঈমাম সাহেব, আপনি নায়েব সাহেবকে আমার পুবের বন্ধের খাজনা বুঝিয়ে দিবেন। আমার জমি এখনো নিলামে উঠে নাই, আমি এই জমি বিক্রি করব না, সব খাজনা পরিশোধ করবো।"
জনতার মাঝে দু-একজন ফিসফিশিয়ে বললো, "কথা ঠিক।"

হাজার মানুষের সামনে নাবিজার বক্তৃতায় আলী হোসেনের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পরলো। এই মুহূর্তে বেহুদার মত কাজ করলে হবে না। স্রোতের অনুকূলে থাকতে হবে। জনতার অভিমতের বিরুদ্ধে যাওয়া আর নিজের পায়ে কুড়াল মারা সমান কথা। সময় শেষ হয়ে যায়নি, নবিজার দিন শেষ, আজ না হোক কাল তার প্রতিশোধ নিতেই হবে।

ঈমাম সাহেব কিছু বলার আগেই আলী হোসেন বললো, " নবিজার জমি, সে যা বলে তাই হবে, সমস্ত খাজনা দেওয়ার ব্যাবস্থা আমি করবো, এরা আমাদের সন্তান।"

ঈমাম সাহেব বললেন, " নবিজার ইচ্ছা, আমি খাজনা পরিশোধ করি, তুমি না, গ্রামবাসী ভাইরা, কথা কি ঠিক বলছি?"

"ঠিক বলসেন ঈমাম সাহেব," সমস্বরে বললো গ্রামবাসী।

গ্রামবাসীরা চলে গেলো এবং নাটকের গল্প বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল আশে পাশের দশ গ্রামে। নবিজার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে রক্ষা পেলো ২০ একর জমি, ঘরে ঘরে সেই গল্প সবার মুখে।

কিন্তু আলী হোসেনের কাছে এই নাটক শেষ হয়নি। পরবর্তী ছোবল মারার অপেক্ষায় আছে সে। এবার সে ঘা খাওয়া বাঘের মতো আক্রমন করবে বিধবাকে।

আলী হোসেন যে কতটা বিষাক্ত, এটা শুধু বাইরের লোক নয়, আপনজনেরাও জানে। সেই আপনজনের একজন এবং ভুক্তভোগী স্বয়ং আলী হোসেনের ভাই রইসুদ্দিন মাওলানা, মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। মাদ্রাসাটা গ্রাম থেকে ৫ মাইল দূরে। সাইকেলে যাতায়াত করেন মাওলানা সাহেব। মাদ্রাসা ছুটির পর মাওলানা সাইকেলে উঠলেন, কিন্তু গন্তব্য বাড়ি নয়, ময়মনসিংহ শহর, তিনি জানেন নবিজা এবং তার দুই শিশু একটুও নিরাপদ নয়। তার ব্যাবস্থা না করে তিনি ঘরে ফিরবেন না।

গতকালের নাটক দেখতে হাজার খানেক মানুষ জড়ো হয়েছিলো, একদিন যেতে না যেতেই নবিজার বৈঠকঘর এবং আশ-পাশের উঠান জুড়ে আবার জড়ো হয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বার, কাচারির নায়েব, আলী হোসেন, মসজিদের ঈমাম সাহেব সবাই উপস্থিত। ময়মনসিংহ শহর থেকে এসেছেন স্বয়ং জেলা প্রশাসক পুলিশ নিয়ে।

উপস্থিত ইউনিয়নের সবার সামনে জেলা প্রশাসক সাহেব ঘোষণা করলেন, "নাবিজা এবং তার সন্তানদের মাথার উপর কোনো পুরুষ নাই, তার মানে এই নয় যে তাদের কেউ নাই। দেশের আইন সবার জন্য। অসহায় ভেবে কেউ যদি এই পরিবারের অনিষ্ট করে অথবা তাদের স্থাবর-অস্থাবর সহায়-সম্পত্তি গ্রাস করার পরিকল্পনা করে, তাদের বিরুদ্ধে আইন-অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এমনকি জেল-জরিমানাও হতে পারে। পুলিশ যদি দ্বিতীয়বার এই গ্রামে আসে, হাতকড়া নিয়ে আসবে এবং খালি হাতে ফিরে যাবে না।" নাটকের প্রথম পর্ব দশ গ্রাম ছুয়েছিল, দ্বিতীয় পর্বে জেলা প্রশাসকের কঠোর নির্দেশ দশ ইউনিয়ন ছাড়িয়ে গেল। যেই আলী হোসেন এক বসায় আস্ত খাসির রান হজম করতে পারে, বদলে যাওয়া মানুষের চাহনি কয়েক দিনের মধ্যে সেই আলী হোসেনের পাকস্থলিতে গুর-মুড় ঝড় তুলে দিলো, অসহ্য বদ হজম, সে দূর-দেশে চলে গেলো লম্বা সফরে। বাকি যারা মনে মনে জমি দখলের সমীকরণ করেছিল, তারা নাবিজার বাড়ির ত্রিসীমানায় আর কোনদিন ঘেষে নাই।

একদিন আসিয়া আর ফাতেমা প্রাইমারি স্কুল শেষ করে ফেললো। নাবিজা বাচ্চাদের সেকেন্ডারী স্কুলে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন, কিন্তু সেকেন্ডারী স্কুল অনেক দূরে, প্রতিদিন যাতায়াত করা সম্ভব নয়। স্কুলের কাছে কারো বাড়িতে লজিং রেখে যে পড়াবেন তাও সম্ভব নয়, কারণ ওরা মেয়ে। আজ যদি ওদের বাবা বেঁচে থাকতেন, নিশ্চয়ই একটা সমাধান বের করতেন। মেয়েদের বাড়িতে বসিয়ে রাখাও মুশকিল। গ্রামের অনেকেই প্রস্তাব দিচ্ছে তাদের ছেলেদের সাথে এই ছোট্ট মেয়ে দুটোর বিয়ে দিতে। বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার মূল কারণ একটাই, মেয়েকে ঘরে তুলতে পারলে সাথে পাবে প্রচুর জমি। আর নবিজাও জানে, জমি লিখে না দিলে সনাতন পদ্ধতিতে অত্যাচারিত হবে তার অবুঝ শিশু। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে, বিয়ে না দিয়ে মেয়েদের ঘরে বসিয়ে রাখলে পাড়া-প্রতিবেশীরা খোচাতেই থাকবে। বাচ্চাদের বাবার শুন্যতা প্রতি মুহুর্তে অনুভব করে নাবিজা, কিন্তু আজ বেশি মনে পড়ছে, সে থাকলে পাড়া-প্রতিবেশীরা চাপ দিতে পারতো না। নিজেকে বড়ই অসহায় মনে হচ্ছে নাবিজার।

এই দুঃসময়ে একদিন মাওলানা তার এক বন্ধুকে নিয়ে নাবিজার বাড়িতে হাজির। বন্ধু দূর গ্রামের আর এক স্কুলের শিক্ষক। নাবিজাও তাকে চিনেন, এর আগেও মাস্টার সাহেব এই বাড়িতে এসেছিলেন বাচ্চাদের বাবার সাথে। তখন উনি বলেছিলেন, "ভাবী, আর একদিন আসবো আপনার মেয়েকে নিয়ে যেতে।" মাস্টারের আজকের আগমন নাবিজার কাছে স্পষ্ট।

মাস্টার বললেন, "ভাবী, আমার ছেলে কলেজে পড়ে, লজিং থাকে দূর গ্রামে, ফাতেমা আমাদের কাছেই থাকবে। ও খেলাধুলা করবে আর আমি ওর পড়ালেখার দায়িত্ব নিলাম।"

নবিজা এই প্রস্তাবে খুশি হননি, কিন্তু রাজি হয়েছেন ক্ষীন আশায়, দুরে গিয়েও যদি মেয়েটা ভালো থাকে, অন্তত পাড়া-প্রতিবেশীদের কু-নজর থেকে রেহাই পাবে।

তের বৎসর বয়সে কিছু বুঝার আগেই ফাতেমার বিয়ে হয়ে গেলো এবং খেলার বয়সেই চলে গেলো দূর গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে।

নতুন বউ দেখার জন্য আশে পাশের বাড়ি থেকে মেয়েরা জড়ো হয়েছে মাস্টার বাড়িতে। চারজন বেয়ারা পাল্কি নামালো উঠানে। ভেতরে আসিয়া

আর ফাতেমা বসে আছে । নাবিজা আসিয়াকেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, দুই বোন জন্মের পর থেকেই একসাথে বড় হয়েছে, শ্বশুর বাড়িতে ফাতেমার একাকিত্ব কিছুটা লাঘব করতেই আসিয়ার আগমন। কয়েকদিন থেকে চলে যাবে আসিয়া।

ফাতেমার শ্বাশুরী আসিয়াকে ডেকে বললেন, "তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও, আর শোনো, ফাতেমা এক পোটলা খেলনা এনেছে, ওগুলো ফেরৎ নিয়ে যাবে।"

পাল্কি যখন ফিরে এলো, আসিয়া আর খেলনার পোটলা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো নাবিজা। চিৎকার করে বললো, "মাওলানাকে খবর দে," তারপর পারিবারিক গোরস্তানে গিয়ে স্বামীর কবরে আছড়ে পড়ে বললেন, "তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, মনে হয় মস্ত ভুল করে ফেলেছি, তোমার ছোট্ট শিশু ফাতেমাকে আমি কোথায় পাঠিয়ে দিলাম?"

ফাতেমার জন্য শোকাতুর নাবিজাকে সামান্য সহানুভূতি তো দুরের কথা, গ্রামের মানুষ উল্টা তাকে শাসালো, "দূর গ্রামে মেয়েকে দিয়ে দিলা, আমাদের ছেলে কি লুলা, অসুবিধা কি? আরেক মেয়েতো আছে, তাকে দাও।" ওরা এবার আসিয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। নাবিজা পণ করেছে, এক মেয়েকে নাবালিকা অবস্থায় দুরে পাঠিয়েছি, সেই ভুল আর নয়।

নাছোড়বান্দা লোভী গ্রামবাসীদের সামাল দিতে নাবিজার পাশে আবার এসে দাড়ালেন মাওলানা সাহেব। এবং একদিন আসিয়ারও বিয়ে হয়ে গেলো, কিন্তু দূর গ্রামে নয়, তারই চাচাত ভাইকে বিয়ে করেছে আসিয়া। গ্রামবাসীদের লোভ-লালসা দূর হলো, জমিও রক্ষা পেলো, আর অন্তত একটা মেয়ে সারাজীবন নাবিজার পাশে থাকবে। পথে-ঘাটে দেখা হলে সসম্মানে মাওলানাকে সবাই সালাম দেয়। আসিয়ার বিয়ের পর বিক্ষুব্ধ কিছু গ্রামবাসী দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর জন্য মাওলানাকে সালাম দিয়ে কটাক্ষ করে বলে, "মাওলানা সাহেব, আপনার মাদ্রাসায় আমার ছেলেকে না দিয়ে ভুল করেছি, একসাথে দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল সব সার্টিফিকেট পেয়ে যেত।"

"মিঞা ভাইয়ের এত রাগ কেন?"

"শুনেছি, একঢিলে মানুষ দুই পাখি মারে, মাওলানা সাব, আপনার নিশানা তীক্ষ্ণ, তিন/চারটা পড়ে যায় এক ঢিলেই, আমাদের মারবেন নাতো?"

"আলাহ আপনার সন্তানদের হেফাজত করুন।"
"আমার পাকা ধানে মই দেন আপনি, আবার ছেলের জন্য দোআ-ও করেন আপনি, মাশালাহ!"

"আলাহ আপনাকেও হেফাজত করুন। লোভ-লালসা আপনাকে সার্কাসের ভাঁড়-এর চেয়ে বড় কিছু বানাতে পারেনি। আপনার কারণে যদি কারো ক্ষতি হয়, বিশেষ করে এতিম শিশুর, এই বান্দা সেখানে হাজির থাকবে।"

এক বৎসর পর ফাতেমা ফিরে এলো বাবার বাড়ি। শীতের সময়, গায়ে শাল জড়ানো। নাবিজা মেয়ের জন্য এটা-সেটা, হরেক রকম পিঠা তৈরী করেছেন। কিন্তু ফাতেমা বলে, "একটু পরে খাব মা।" নাবিজা মেয়েকে ধরে নিয়ে গেলেন ঘরের ভিতরে, সবার আড়ালে। শাল সরিয়ে মেয়ের
দুই হাত তুলে ধরলেন, ছেড়া কাপড়ের পট্টি বাধা দুই তালুতেই। নাবিজা হাতের তালু চুমু দিলেন। ফাতেমা ডুকরে কেঁদে মাকে জড়িয়ে ধরলো। নাবিজা শক্ত হয়ে প্রশ্ন করলো, "আমাকে জানাওনি কেন? আমি কি তোমার পর?"

"তুমি যদি এইসব জানো, কষ্টে মরে যাবা, তখন আমি কার কাছে আসব?"

"মাস্টার জানে?"

"না।"

"জানাওনি কেন?"

"তাহলে আমার শ্বাশুরী আরো দ্বিগুন কাজ দিবে।"

"যে বয়সে হাতে ফোস্কা পড়ার কথা, তার অনেক আগেই আমি তোর জন্য সে ব্যবস্থা করে দিয়েছি, আমাকে মাফ করে দিস"।

"মা, যাদের বুদ্ধি আছে, তাদের হাতে ফোস্কা পড়ে না। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার মেয়ে আর বোকা থাকবে না. রাখোত এইসব, ক্ষিদে পেয়েছে, পিঠা দাও।"
"মাওলানা তোকে দেখতে যায়?"

ফাতেমার কাজ, আপনার কোমর ব্যথা, আপনারটাও করবো, ফাতেমাকে যেতে দিন।"

শ্বাশুরী ভিড় ঠেলে ফাতেমার সামনে এসে চিৎকার করে বললেন, "তিল-তিল করে গড়েছি আমি এই সংসার, তোমার কারণে পাড়ার পুচকি মেয়েরা আমাকে শলা-পরামর্শ দেয়, তুমি যাও, এই মুহূর্তে আমার সামনে থেকে চলে যাও।"
ফাতেমা তার শ্বাশুড়িকে জপটে ধরে অঝোর ধারায় ডুকরে কেঁদে ফেললো, এই বাড়িতে প্রথম বারের মতো কাঁদলো ফাতেমা।

উঠানে পাল্কি থেকে নেমেই দেখলো মাওলানা চাচা বসে আছেন, তার চরিদিকে পাড়া-প্রতিবেশী, যেন এটা একটা মরা বাড়ি, কেউ মারা গিয়েছেন। ঘর ভর্তি মেয়ে মানুষ। মার হাত ধরে কাঁদছে আসিয়া। ফাতেমাকে দেখে অনেকে ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, "নাবিজা এখন শান্তিতে মরতে পারবে।" মার পাশে এসে আচল থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলে টাকা বের করে একটা রুমাল ভরে বাইরে চলে গেল ফাতেমা। রুমালটা মাওলানা সাহেবের হাতে দিয়ে বললো, "চাচা, এই দেশের সবচেয়ে ভালো ডাক্তারকে নিয়ে আসেন, এক্ষুনি, যেখান থেকে পারেন।" তিন ঘন্টার মধ্যে মাওলানা জেলা প্রশাসকের গাড়ি নিয়ে হাজির। ফাতেমা, আসিয়াসহ নাবিজাকে নিয়ে মাওলানা রওয়ানা দিলেন রাজধানী ঢাকার দিকে।

একমাস পর ফাতেমা ফিরে এলো শ্বশুর বাড়ি। সারা বাড়ি হৈ-চৈ, বিশেষ করে আশ-পাশের বাড়ির মেয়েরা ছুটে আসলো। মার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে প্রতিবার ফাতেমা কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি আসে, এইবার এসেছে গর্ব নিয়ে। এ যাত্রা মা বেঁচে গেছেন, মৃত্যুসজ্জা থেকে মাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ এতবড় যে, শ্বশুর বাড়ির কোনো অত্যাচার তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু শ্বাশুরী আগের চেয়েও বেশি গম্ভীর, ফাতেমাকে কিছুই জিগ্যেস করলেন না। তোমার মা কেমন আছেন? কেন একমাস দেরী হলো? কিছুই না। তারপরও ফাতেমা শ্বাশুরীর কাছ-লাগা হয়ে গেলো। ভারী ধানের ঝুড়ি তুলতে চাইলে ছুটে আসে ফাতেমা, কেড়ে নেয় শ্বাশুরীর হাত থেকে। শীতের রাতে কাছে এসে লেপ মুড়ে দিয়ে যায়। মাস্টার সাহেব কোনো কারণে তার স্ত্রীর উপর রাগ করে কিছুই বলতে পারেন না, মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় ফাতেমা। এইসব নাক গলানো শ্বাশুরীর অপছন্দ। মাঝে মাঝে ফাতেমাকে বকা-ঝকাও করেন, "তোমার কাজ তুমি কর, এত বিরক্ত কর কেন?" ফাতেমা কোনো কথাই শুনে না। তার একটাই চিন্তা, "আমার শ্বাশুরী যেতে দিয়েছিলেন বলেই মা আজ বেঁচে আছেন, উনি আমাকে যতই দুরে ঠেলুক, আমি থাকব তার পাশে।" যখন শাশুরী বেশী বিরক্ত হন, ফাতেমা জপটে ধরে চুমু দিয়ে পালিয়ে যায়. উনি তখন চিৎকার চেচামেচি শুরু করে দেন, "বেসরম মেয়ে, পাজি মেয়ে, আমার কাছে আসবে না।"

একদিন শ্বাশুরী ফাতেমাকে ডেকে পাশে বসালেন, "তোমার মাতব্বরি আর ভালো লাগে না। আমি খুব বিরক্ত। এখন থেকে তুমিই সংসার দেখাশুনা করবে, এই নাও চাবি।"

সংসারের টুকিটাকি খবর হাট-বাজারের দিন এবাড়ি থেকে ওবাড়ি আদান-প্রদান হয়। নাবিজা গোরস্থানে তার স্বামীর কবরের পাশে বসে বললো, "তোমার মেয়ে তার শ্বাশুরীর মন জয় করেছে, তুমি থাকলে অন্তত একটা পুরস্কার দেয়ার জন্য আজ দৌড়ে যেতে মেয়ের কাছে।"

সতেরো বৎসর বয়েসে ফাতেমা মাস্টার বাড়ির রাজত্ব পেয়েছিলো, কিন্তু বেশিদিন উপভোগ করতে পারেনি। তার স্বামী বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে সরকারী চাকরী পেয়েছে। বাড়ি এসেছে ফাতেমাকে নিয়ে যেতে। শ্বাশুরী ফাতেমাকে ধরে ডুকরে কেঁদে ফেললো, "আমি একজন ভালো স্বামী পেয়েছি, আল্লাহ আমাকে ৫ টা সন্তান দিয়েছেন, কিন্তু আমার কোনো 'সই' নাই, এই বয়সে তোমাকে পেয়েছিলাম, এখন তুমিও চলে যাচ্ছ?""মা, আমাকে হাসি মুখে বিদায় দেন, আমি যাচ্ছি নতুন দুনিয়াতে, কথা দিচ্ছি প্রতি বৎসর আসব।" সংসারের চাবি ফেরৎ দিয়ে চলে গেল ফাতেমা।

দিন গড়িয়ে গেল অনেক। এর মধ্যে আসিয়া জন্ম দিয়েছে চার সন্তান এবং ফাতেমা ছয় সন্তান। পাল্টে গেল নাবিজার দিন, আসিয়ার বাচ্চাদের নিয়ে ব্যস্ত সারাক্ষণ, ওদের গল্পের শেষ নাই। স্কুলের গল্প, খেলাধুলা আর মাছ ধরার গল্প। এর মধ্যে প্রায়ই ঢাকা যেতে হয় তাকে, বিশেষ করে ফাতেমার অন্তসত্তার সময়টা পাশে থাকেন নাবিজা। ঢাকার নাতিদের দেখাশুনা করা, তাদের ঘুম পড়ানো, সব নাবিজার কাজ। রাতে বাচ্চাদের গল্প বলতেই হবে, নাহলে ওরা ঘুমাবেনা।

"আমার মস্তবড় একটা কুকুর আছে, ওর নাম 'ভোলা'। ওর ঘেউ ঘেউ শুনে শেয়াল আমার বাড়ির দশ মাইল দূর দিয়ে যাতায়াত করে। হাঁস-মুরগি আর ছাগল, কিছুই নিতে পারেনা ওরা।

কিন্তু সমস্যা হলো, যখন আমি ঢাকা আসি, ভোলা আমাকে ছাড়তে চায় না। বাড়ি থেকে রিক্সায় চড়লেই ও বুঝে ফেলে আমি ঢাকা যাচ্ছি, প্রতিবাদ করে লম্বা একটা ঘেউ দিবে, তারপর রিক্সার পেছনে দৌড়াবে। যতই বলি, "ভোলা তুই বাড়ি যা, হাঁস-মুরগি কে দেখবে?" কিন্তু আমার কথা কে শুনে? গুদারা ঘাটে রিক্সা থেকে নেমে আমি ফেরীতে চড়ি, ভোলা লাফ দিয়ে ফেরীতে উঠতে চায়। আমি ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দেই, ও নদীর তীরে বসে লম্বা ঘে-উ দিয়ে তাকিয়ে থাকবে যতক্ষণ ফেরী চোখের আড়াল না হয়।"

"এখন ভোলা কি করছে?" প্রশ্ন করে বাচ্চারা।

"নদীর তীরে বসে আছে, আর প্রতিটি ফেরীর দিকে নজর রাখছে কখন আমি ফিরে আসি। তারপর যেদিন আমি ফিরে যাই, ভোলা দূর থেকে বুঝে ফেলে, আমি এই ফেরীতে আছি, ঘাড় উঁচু করে ঘর-ঘর শব্দ করবে কিছুক্ষণ, তারপর একটা ঘেউ, দুইটা ঘেউ, পরে একটা লম্বা ঘে-উ। হাটু পানিতে নেমে ঝাপা-ঝাপি, তীরে ফেরী ভিড়ার আগেই সে লাফিয়ে ফেরীতে উঠবে। আমি রিক্সা নিলে, ও দৌড়ে একবার রিক্সার আগে যাবে, একবার পেছনে, তারপপর রিক্সার পাশ ঘেষে পাহারা দিয়ে আমাকে বাড়ি নিয়ে আসবে। বাড়ি পৌছার আগেই ভোলা দৌড়ে বাড়ির উঠানে চলে যাবে আর লম্বা একটা ঘে-উ দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিবে যে আমি এসেছি। পাড়ার ছোট ছেলে-মেয়েরা তখন হৈ-হৈ, রৈ-রৈ করে ছুটে আসে রিক্সার পাশে, "ভোলা এসেছে, নানী এসেছে।"

"তোমার হাস-মুরগী কোথায়? সব শিয়ালে খেয়ে ফেলেছে?"

"উহু, তোদের নানু এতই বোকা? সেই গল্প আরেকদিন বলবো, এখন ঘুমাও।"

[Mesbah (18th Batch), Manager, IAD, Ocean Tankers Pte Ltd.,Singapore]